ঢাকাঃ বাঙ্গালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক রাজধানী

ফাহমিদ-উর-রহমান

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

ওআইসি (ইসলামী সম্মেলন সংস্থা) যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এর পেছনে উদ্যোক্তাদের যে আবেগ ও স্বপ্ন ছিল, তা বোধ হয় এতোদিনে অনেকখানি ফিকে হয়ে গেছে। যে ফিলিস্তিনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর ইসরাইলের আগ্রাসনের মুখে ওআইসি□র জন্ম, সেই আধিপত্যবাদ বহাল তবিয়তে চলছে। কিন্তু ইসলামী দুনিয়ার ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের তেমন কিছুই এখন আর দৃশ্যমান নয়। আজকের একমেরু বিশ্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অপ্রতিহত তর্জন-গর্জনের সামনে মুসলিম দেশগুলোর সমবেত সংগঠনের স্বর যেন একেবারে নিচু হয়ে গেছে। এই ওআইসির একটি অঙ্গসংগঠনের নাম হচ্ছে Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization, সংক্ষেপে ISESCO, অনেকটা জাতিসঙ্ঘের UNESCO-র মতো। মুসলিম দুনিয়ার শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক জাগরণের জন্য এটির প্রতিষ্ঠা। বাস্তবে এটি কী করতে পেরেছে, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। এই ISESCO এবার ঢাকাকে ঘোষণা করেছে ইসলামী সংস্কৃতির রাজধানী হিসেবে। ISESCO-র এবারকার থিম হচ্ছে Dhaka: The Capital of Islamic Centre for Asian Region ২০১২। ISESCO-র ঘোষিত এই থিমের চেতনা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়ার যে ভূমিকা নেয়া উচিত ছিল, তার কিছুই হয়নি। বাংলাদেশের আপামর মানুষও এই থিমের বিষয়টি খুব সম্ভব কিছু জানে না। বাংলাদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় দায়সারাভাবে একটি ইসলামী বইমেলার আয়োজন করেছিল জাতীয় গ্রন্থাগার চত্বরে। মেলায় গিয়ে দেখেছি, ইসলামী সংস্কৃতি কিংবা মুসলিম সংস্কৃতির রাজধানী ঢাকার ওপর তেমন কোনো বইই নেই। জরাজীর্ণ ISESCO-র মতো আমাদের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়েরও জরাজীর্ণ অবস্থা।

যাই হোক ISESCO-র থিমটি চমৎকার। এর আছে একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। একদিনেই ঢাকা একটি মুসলিম অধ্যুষিত জনপদের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইতিহাসের বিচিত্র পথ চলা ও বিবর্তনের ভেতর দিয়ে ঢাকা আজকে একটি স্বাধীন মুসলিম দেশের রাজধানী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আমাদের সেকুলার বন্ধুরা মুসলিম দেশ বললে ভ্রুকুঞ্চিত করতে পারেন, কিন্তু ইতিহাসের নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত জনপদে পরিণত হয়েছে, এটা কি অস্বীকার করা যাবে? অনেক বছর ধরেই পূর্ববঙ্গ বা আজকের বাংলাদেশ মুসলমানপ্রধান। আর পূর্ববঙ্গের কেন্দ্র ছিল ঢাকা। সপ্তদশ শতকে মোগলরা তাদের সুবে বাংলার রাজধানী করে ঢাকাকে। সুবে বাংলার সুবাদার ইসলাম খান মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গিরের নামে এই শহরের নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। মোগল রাজধানী ঢাকার সাংস্কৃতিক মেজাজ কিছুটা আঁচ করা যায় হাকিম হাবিবুর রহমানের আসুদে গান □এ ঢাকা ও ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে□ এবং সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুরের □Glimpses of Old Dhaka□ পড়লে। আরও লিখেছেন মশহুর অধ্যাপক আহমদ হাসান দানী ও আবদুল করিম সাহেব। মোহররমের মিছিল, রমজানের কাসিদা-সরগাই, ইফতারির রকমারি বাহার, ঈদের আনন্দ উল্লাস-নহবত, পোলাও-কোরমা-বিরিয়ানি-কাবাব-বাকরখানি-মসলিন-জামদানি এসবের মধ্যে মোগল ঢাকার এক নিভৃত সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বড় ভাই বিশিষ্ঠ নন্দনতাত্ত্বিক ও শিল্প সমালোচক শাহেদ সোহরাওয়ার্দী রন্ধন বিষয়ে একটি বই লিখেছিলেন, যা প্রকাশ করেছিল বিখ্যাত প্রকাশক থ্যাকার স্পিংস। এখানে তিনি ঢাকার রান্না বিষয়ে মনোজ্ঞ সব আলোচনা করেছিলেন।

ইংরেজরা বাংলা দখল করার পর অষ্টাদশ শতকে কলকাতার উত্থান ঘটতে থাকে। আর ঢাকা নিমজ্জিত হয় অন্ধকারে। ঊনবিংশ শতকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালি মুসলমানের নেতৃত্ব দেন নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকা স্বল্প সময়ের জন্য পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হয়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে ঢাকা আবার

রাজধানীর মর্যাদা হারায়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ভিতর দিয়ে ঢাকার যেমন সাংস্কৃতিক জাগরণ শুরু হয়, তেমনি বাঙ্গালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশলাভের পথ সহজ হয়। ১৯৪৭ সালে ঢাকা হয় নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর স্বাধীন দেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুতগামী হয়। বিশেষ করে গত প্রায় ৬৫ বছরে (১৯৪৭-২০১২) ঢাকাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এক সামগ্রিক জাগরণ তৈরি হয়েছে। রাজনীতি-অর্থনীতির পাশে সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলার জগতে নতুন নতুন মুখ ও ধারা তৈরি হয়েছে।

বাঙ্গালি মুসলমানের ইতিহাস লিখতে গেলে ইসলামের বিপুল প্রসার ও তার বৈপ্লবিক ভূমিকার মধ্যে আমাদের চোখ ফেরাতে হবে। ইসলাম নিয়ে একসময় লেখালেখি করেছিলেন মনস্বী বিপ্লবী এম এন রায়। তিনি তার বিখ্যাত বই Historical Role of Islam-এ বলেছেনঃ ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রচারিত হয়েছিল, এ কথাটা সত্য নয়। মূলত ইসলাম একটি নতুন সমাজ ও নতুন চিন্তাধারার পথকে উন্মুক্ত করেছিল, যেখানে ছিল মানবমুক্তির নিশ্চয়তা। এই কারণেই ঘুণেধরা প্রাচীন সভ্যতার জনগণের কাছে ইসলাম এতো আদরণীয় হয়েছিল, অন্যদিকে তার অসাধারণ বিস্তার সম্ভব হয়েছিল।

বিশ্বসভ্যতায় ইসলামের এই অবদান প্রসঙ্গে এম এন রায়ের বিশ্লেষণ, অকপট স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ইসলাম বা বাঙ্গালি মুসলমান সম্পর্কে দু-একটি কথা বলতে চাই। ইসলাম তার অবিশ্বাস্য বিস্তারের যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্রে গড়ে তুলেছিল ইসলামী সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র। দামেশক, বাগদাদ, কর্ডোভা, ইস্পাহান, বোখারা, দিল্লি, আগ্রা, লাহোরের মতো ঢাকাও এমনি একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এসব কেন্দ্র বিকশিত হয়েছিল ইসলামী সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানগত-কালগত রঙ ও রূপের সংমিশ্রণে। পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তার □ইসলাম ধর্মের রূপরেখা□ বইয়ে বলেছেন, উদারতার কারণেই স্থানিকতাকে স্বীকার করে নেয়ার ফলে ইসলাম ভূমন্ডলে সম্প্রসারিত ও প্রভাবশালী হয়েছে। এ উক্তি বাঙ্গালি মুসলামানের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। এইভাবে বাঙ্গালি মুসলমানের একটি নিজস্ব জীবনচেতনা ও জীবনধারা গড়ে উঠেছে। বাঙ্গালি মুসলমানের জীবনধারায় বাংলা ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যভ্যাস, আচার-আচরণ, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ঈদ, মোহররম, শবেবরাত, রমজান মিশে আছে। এগুলোর সম্মিলিত রূপ হচ্ছে আমাদের বাঙ্গালি মুসলমানের সংস্কৃতি। ইসলাম আবির্ভূত হয়েছে সপ্তম শতাব্দীতে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় মুসলিম প্রশাসন কাজ শুরু করে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের ভেতর দিয়ে। কিন্তু বঙ্গবিজয়ের আগেই পীর, আউলিয়া, দরবেশ ও আরব ব্যবসায়ীরা বাংলার গণজীবনে প্রবেশ করে ইসলামের সাম্য-মৈত্রীর বাণী প্রচার শুরু করেছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাদের কিছু স্বর্ণমুদ্রা (দিনার) রক্ষিত আছে। এগুলো খলিফা আল-মানসুর, হারুন-অর-রশীদ, আল মামুনের জামানার। এগুলো পাওয়া গেছে বাংলাদেশের চাঁদপুর জে.লায়। এ থেকে মনে করার সংগত কারণ আছে, বখতিয়ার খিলজি আসার আগে বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে ইসলামের পরিচয় ঘটেছিল।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত আটশ□ বছর হলো বাঙ্গালি মুসলমানের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। মধ্যযুগজুড়ে একচ্ছত্র রাজত্ব করেছে ইসলাম। ছয়শ□ বছরের বেশি সময় ধরে এদেশের রাষ্ট্রভাষা ছিল ফারসি। ১৮৩৭ পর্যন্ত ফারসি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বহাল থাকার কারণে বাঙ্গালি মুসলমান ও বাংলা ভাষার ওপর আরবি-ফারসির একটি বড় প্রভাব রয়েছে। মধ্যযুগের আলাওল এমনই একজন কবি, যার ওপর ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি। আলাওল তার কাব্যের কাহিনী গ্রহণ করেছেন ফারসি কাব্য □সিকান্দার নামা□ ও □হফত পয়কর□ থেকে। আলাওল বাংলা লিখেছেন ফারসি অক্ষরে, আমাদের মতো বাংলা অক্ষরে নয়। ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় ফোর্ট উইলিয়ামের সাম্প্রদায়িক পন্ডিতরা বাংলা ভাষা থেকে এই মুসলমানি প্রভাব হঠানোর বহু চেষ্টা করেছিলেন।

> মুসলিম সুলতানদের জামানায় বাংলা ভাষার বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল। সুলতানদের সাহায্য ছাড়া বাংলা ভাষা আজকে সংস্কৃত ভাষার মতো একটি মৃত ভাষায় পরিণত হতো। দীনেশ চন্দ্র সেনের মতো পন্ডিতরাও সে কথা মুক্তমনে স্বীকার করেছেনঃ ব্রাহ্মণগণ প্রথম বাংলা ভাষা গ্রহণ ও প্রচারের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ইহারা □সর্বনেশে□ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। □ আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুসলমানগণ ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুক না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালি হইয়া পড়িলেন। (দীনেশ চন্দ্র সেনঃ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

ভাষা এক হলেও বাঙ্গালি হিন্দু ও বাঙ্গালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক চেতনা কিন্তু একই ধারায় প্রবাহিত হয়নি। কারণ তাদের ধর্মবিশ্বাস ও ইতিহাসের ধারা এক নয়। এই সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কথাটা ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তার বাংলার ইতিহাস

বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা কতেছেন। এই সাংস্কৃতিক পার্থক্যের জন্যই বাঙ্গালি মুসলমান একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, রাষ্ট্র তৈরি করেছে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতার ভেতর দিয়ে বাঙ্গালি মুসলমান একটি পৃথক রাজনৈতিক সত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাঙ্গালি হিন্দুরা সেটা করেনি। তারা বিশ্বাস করেছেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদে; কারণ ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতিকেই তারা ভেবেছেন আপন সংস্কৃতি হিসেবে। কিন্তু বাঙ্গালি মুসলমানের পক্ষে সেটা ভাবা সম্ভব হয়নি। সম্ভব হলে আজকের পৃথক রাষ্ট্র বাংলাদেশের উদ্ভব হতো না। ভারতের সঙ্গে একত্রিত হয়ে এক মহাজাতির আশ্রয়ে তারা থাকতে চাইতেন। একটি জনসমাজ তখনই একটা পৃথক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চায়, যখন সেই জনসমাজ মনে করে তার শান্তি, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্যে একটি পৃথক রাষ্ট্রের প্রয়োজন। একটি জনগোষ্ঠী পৃথক রাষ্ট্র গড়তে চায় তখনই, যখন সে মনে করে অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে সে আলাদা। এই পার্থক্য চেতনার মূলে কাজ করে তার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধের অনুভব। বাঙ্গালি মুসলমানের এই যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, তা গত আটশ বছর ধরে বিকশিত হয়েছে। জাতীয়তা, জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠতে সময় লাগে। তা হলো বহু মানুষের চেষ্টার ফল। আজকে বাংলাদেশী সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের কথা বলা হচ্ছে। এটি কিন্তু বহু মানুষের চেষ্টায়, বহু শতাব্দী পাড়ি দিয়ে আজকের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। কোনো পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে রাতারাতি এর অভ্যুদয় ঘটেনি।

উত্তর ভারতে যখন বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তি ঘটছে, বাংলায় তখন বৌদ্ধ রাজারা শাসন করছেন। গোঁড়া, সাম্প্রদায়িক সেনরাজাদের সময় বৌদ্ধরা হন লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত। পরবর্তীকালে এই লাঞ্ছিত বৌদ্ধরাই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেন। এর ফলে এদেশে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে মধ্য এশিয়া থেকে আগত মুসলমানদের সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে। হিন্দু আর বৌদ্ধ স্থাপত্য একরকম নয়। বৌদ্ধরা খোলামেলা ঘরে সমবেতভাবে প্রার্থনা করে। হিন্দুদের সমবেত প্রার্থনা নেই। হিন্দু মন্দিরে পূজা করার অধিকার কেবল হিন্দু পুরোহিতদের। হিন্দুরা পূজায় বিগ্রহ দর্শন করে। মন্দিরের ছোট ঘরে থাকে সেই বিগ্রহ। হিন্দু মন্দিরের স্থাপত্য ও বৌদ্ধ মন্দিরের স্থাপত্য এক নয়। বাংলাদেশের সুলতানি আমলের মসজিদগুলোতে পড়েছে কিছুটা বৌদ্ধ স্থাপত্যের ছাপ। প্রাচীন মসজিদগুলোর গম্বুজের আকৃতি মনে করিয়ে দেয় বৌদ্ধ স্তূপের আকৃতির কথা। প্রাচীন মসজিদগুলোর নকশাকলায় (Motif) দেখা যায়, বৌদ্ধ নকশাকলার প্রভাব। বাংলাদেশের প্রাক-মুসলিম পর্বে হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি একরকম ছিল না। ছিল হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধ। বাংলাদেশে তুর্কি সুলতানদের আমলে যে সংস্কৃতির বিকাশ হয়, তাও কিন্তু ছিল হিন্দুদের থেকে আলাদা। এই পৃথক সংস্কৃতিকেই বলা যায়, আজকের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক ভিত্তি। অর্থাৎ বাঙ্গালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হচ্ছে এদেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও মুসলিম মধ্য এশিয়ার ঐতিহ্যের সমন্বয়। পরে মোগল আমলে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাফাভিদ ফারসি সংস্কৃতির প্রভাব। তুর্কি সুলতানরা মোগলদের মতো এতোখানি ফারসি সংস্কৃতি প্রভাবিত ছিলেন না। তুর্কি আমলে ফারসির চেয়ে আরবি ভাষায় লিখিত শিলালিপি বাংলাদেশে বেশি পাওয়া গেছে।

সাবেক পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার অনেক কারণ ছিল, কিন্তু এর মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে, বাঙ্গালি মুসলমানদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য চেতনা ও দু অঞ্চলের ভৌগলিক তফাৎ। এক একটি জাতি গড়ে উঠে ইতিহাসের ধারায়। আমাদের আজকের জাতীয়তাবাদকে তাই বুঝতে হলে আমাদের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করতে হবে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই আমাদের সংস্কৃতি চেতনার সমগ্র স্বরূপকে বুঝতে হবে। এই ইতিহাসের শুরুটা হয়েছিল বৌদ্ধ পাল রাজাদের সময় থেকে। কারণ বৌদ্ধ সাধকদের হাতে বাংলা ভাষার প্রাথমিক রূপটা তখন আত্মপ্রকাশ করছে।

আবার বাংলাদেশের মানুষ ধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। এই ধর্মের সমতাবাদী, মানবপ্রেমী চরিত্র তাদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল। আর তাই তারা চেয়েছিল এই নতুন ধর্মমতের ভিত্তিতে তাদের জীবনযাত্রাকে পরিচালিত করতে। এ ছিল তাদের স্বাধীন ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। আজকের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে ব্যাখ্যা করতে হলে তাই ইসলামের ভূমিকাকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হবে।

> সংস্কৃতির দুটো অংশ থাকে। একটি আদর্শিক, অন্যটি স্থানিক। ইসলাম দেশে দেশে এই স্থানিক সংস্কৃতি অনায়াসে আত্মস্থ করে নিয়েছে, যতক্ষন না তার আদর্শিক ভিত্তিকে আঘাত করে। যেমন, বাঙ্গালি মুসলমান স্থানীয় পোশাক নিয়েছে, স্থাপত্য নিয়েছে, খাবার নিয়েছে। পুলিপিঠা, পাটিসাপটা, ইলিশভাজা, আলুভর্তা, শুঁটকিভর্তা, ভাটিয়ালি, জারি, সারি, মুর্শিদি তার সংস্কৃতির অংশ। কিন্তু সে প্রতিমা পূজা করে না। তৌহিদ হচ্ছে বাঙ্গালি মুসলমানের মূল। এর সঙ্গে আছে বাঙ্গালি মুসলমানের সংগ্রামশীলতা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, ধর্মীয় সহনশীলতা, অসাম্প্রদায়িকতা বোধ।

বাঙ্গালি মুসলমানের সংস্কৃতিতে এসবের ছাপ। বাঙ্গালি মুসলমান তার ধর্মও ছাড়েনি, ভাষাও ছাড়েনি; মুসলমানিত্ব ও বাঙ্গালিত্বের সমন্বয় করেছে। বাঙ্গালিত্বকে প্রবহমান রেখে সে বিশ্ব মুসলমানের সঙ্গে একাত্ববোধ করেছে। আমাদের জাতীয় কবি নজরুল তার

গানে যেমন বলেছেন, তুরানী-মিশরী-ইরানীর সঙ্গে আজ বাঙ্গালি মুসলমানও জামাতবদ্ধ হয়েছে। এই সংস্কৃতির রাজধানী হচ্ছে ঢাকা। ISESCO-র ঘোষণার তাৎপর্য এখানেই।

সূত্রঃ বুকমাস্টার প্রকাশিত বাংলাদেশ জিন্দাবাদ গ্রন্থ

ফাহমিদ-উর-রহমান

ফাহমিদ-উর-রহমান একজন মননশীল প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবী। পেশায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হলেও ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি লিখছেন। সমাজ ও সংস্কৃতি সচেতন বিধায় তিনি আধুনিকতার সমস্যা নিয়ে লিখেছেন। আধুনিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। তার ঋদ্ধ লেখালেখি নতুন আঙ্গিকে বাঙালি মুসলমানের জাতিসত্তার উপরে আলোকপাত করেছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নামঃ ১। ইকবাল মননে অন্বেষণে (১৯৯৫) ২। অন্য আলোয় দেখা (২০০২) ৩। উত্তর আধুনিকতা (২০০৬) ৪। সেকুলারিজমের সত্য মিথ্যা (২০০৮) ৫। উত্তর আধুনিক মুসলিম মন (২০১০) ৬। সাম্রাজ্যবাদ (২০১২) ৭। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ (২০১৩) ৮। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও বাংলাদেশ (২০১৪) পাশাপাশি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ১। জামাল উদ্দীন আফগানী: নব প্রভাতের সূর্য পুরুষ (২০০৩) ২। মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭ (২০০৯) ৩। ফরায়েজী আন্দোলন : আত্মসত্তার রাজনীতি (২০১১)